ধর্মীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চেতনা— মমিকরণ ও পিরামিড

বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতার সবথেকে বড়ো অবদান নিঃসন্দেহে তার পারলৌকিক চিন্তা-চেতনার দুই বাস্তব বহিঃপ্রকাশ— মানুষের দেহের মমিকরণ এবং সুউচ্চ সমাধি মন্দির পিরামিড স্থাপত্য। এই দুটি সর্বাধিক সুপ্রসিদ্ধ উপাদানই মূলত আধিবিদ্যক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত— মিশরীয় ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য আগে মিশরীয় সাধারণ ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তারপর আধিবিদ্যক চেতনা সংক্রান্ত আলোচনা সংযোজন করা হয়েছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে প্রাচীন মিশরের সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতিগুলির খুব পার্থক্য ছিল না। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর দেবত্ব আরোপ, পশুকে দেবতা হিসাবে আরাধনা এবং উর্বরতা তথা সমৃদ্ধির কামনা— এই ছিল এই ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল উপাদান। একথা বলা বাহুল্য যে, এই ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধর্মচেতনারই স্বাভাবিক বিবর্তিত রূপ। ক্রমশ পশুর উপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে দেবতারা মানবীয় আকৃতি লাভ করে এবং পশু দেবতার প্রতীকচিহ্ন অথবা বাহন হিসাবে অধঃপতিত হয়। মিশরীয় ধর্ম চেতনায় বহু ঈশ্বরের নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে গ্রিক ও রোমানদের ধর্মবিশ্বাসের উপর মিশরীয় দেবতাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত উর্বরতার দেবতা সেরাপিস এবং দেবী ইসিস-এর গভীর প্রভাব দেখা যায় হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির উপর।

মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী ঈশ্বর মণ্ডলের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল আতুম (Atum)। পরবর্তীকালে তাকে সূর্যের দেবতা রে (Ra)-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে চিহ্নিত করা হয়। আতুম তার দৈব ক্ষমতাবলে দুই দেবতার জন্মদান করে। যথা, শু (Shu) এবং তেফেনেট (Tefenet)। শু হল বাতাস এবং তেফেনেট হল আর্দ্রতা। এই দুই দেবতা গেব (Geb) অর্থাৎ পৃথিবী এবং নাট (Nut) অর্থাৎ আকাশের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। এই গেব এবং নাটের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই এদের আদি পিতা ও আদি মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। এদের থেকে জন্ম হয় চার দেবদেবীর, যারা মিশরীয়দের চার গোষ্ঠীর প্রধান আরাধ্য দেবতা হিসাবে চিহ্নিত। এই চার দেবদেবী হল, মৃত্যুর দেবতা ওসিরিস, উর্বরতার দেবী ইসিস, নৈরাজ্যের সেঠ, মৃত্যু অভিজ্ঞতার দেবী নেফথিস। এদের থেকেই বৃহত্তর ঈশ্বর মণ্ডল (Pantheon) এবং মানুষ জগতের সৃষ্টি বলে মনে করা হত। অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে হোরাস, আনুবিস, বস্তে, সোবেক, সার্কেট, নেখবেট প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের যে কেবল অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, অনেক সময় নামেরও পরিবর্তন দেখা গেছে। যেমন সূর্যের দেবতা রে পরবর্তীকালে প্রথমে আমন ও পরে আমন রে নামে পরিচিতি লাভ করে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫০ অব্দ নাগাদ মিশরের ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ ধর্মসংস্কারের প্রচেষ্টা করেন এবং সূর্যদেবতার উপাসনার রীতি উদ্ভাবন করেন। তবে এই নতুন সূর্যদেবতা প্রচলিত রে বা আমন রে নয়, বরং সুপ্রাচীন আতুম-এর অনুরূপ আটন। শুধু সূর্যের দেবতা নয়, তাকে শৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতিরও রক্ষাকর্তা বলে কল্পনা করা হয়। আটনের উপাসক হিসাবে আমেনহোটেপ ইখনাটন উপাধি গ্রহণ করেন। তবে ফারাও-এর রাজকীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই সংস্কার খুব একটা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। টুটেনখামেনের রাজত্বকালে আবারও পুরোনো ধর্মীয় আদর্শ গুরুত্বলাভ করে এবং পুরোহিতরা তাদের পুরোনো ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পায়। ক্রমশ জাদুবিদ্যা এবং উপজাতীয় রীতির প্রভাব এই ধর্মকে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলে। ফলে শুরু হয় অবক্ষয়ের যুগ। তবে তা সত্ত্বেও প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের অস্তিত্ব প্রায় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বজায় ছিল ফিলির ইসিস দেবীর মন্দিরের সঙ্গে।

মিশরের আধিবিদ্যক চিন্তা-চেতনা মূলত আবর্তিত হয়েছে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের রহস্যকে কেন্দ্র করে। মিশরের মমিকরণ ও পিরামিড সংস্কৃতি ছিল ওসিরীয় অর্চনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। যেহেতু মিশরের রাজবংশগুলি এবং অধিকাংশ অভিজাত ও সাধারণ মানুষ ধর্মীয়ভাবে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ফলে এটিই হয়ে উঠেছিল মিশরের প্রধান সম্প্রদায়। সাধারণভাবে মিশরীয়রা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তারা শরীরকে অত্যন্ত প্রাধান্য দিত। তাই মৃত্যুর পরেও শরীরকে অবিকৃত রাখার প্রচেষ্টা তারা

আপ্রাণভাবে করত। শরীরকে কেন্দ্র করে এই আধিবিদ্যক চিন্তা-চেতনার উন্মেষের জন্য মিশরের মরুভূমি অঞ্চলের জলবায়ু অনেকখানি দায়ী ছিল। সাধারণ প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির মতোই মিশরীয়রাও প্রাথমিকভাবে পশ্চিমের মরুভূমি অঞ্চলে মৃতদেহ সমাহিত করত। মরুভূমির শুষ্ক বালুকাময় মাটিতে মৃতদেহের পচন অনেক দেরিতে হওয়ায় বহুদিন পর্যন্ত মৃতদেহ অনেকটাই অবিকৃত থাকত। এখান থেকেই সম্ভবত মৃত্যু-পরবর্তী অবিকৃত নিরবচ্ছিন্ন জীবনের ধারণা গড়ে উঠেছিল। শুরু হয়েছিল মৃতদেহকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। এর ফলেই তাঁরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন মমিকরণের মতো বিস্ময়কর মৃতদেহ সংরক্ষণ পদ্ধতির।

গবেষকদের নিরন্তর গবেষণা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত মমিকরণের পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়ার পুনরাবিষ্কার বা তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর হয়নি। যেটুকু জানা গেছে তা হল, মৃতদেহ থেকে প্রথমে মস্তিষ্ক ও অন্যান্য সমস্ত আন্তর্যন্ত্র নিষ্কাশন করা হত শল্য চিকিৎসা ও বিগলন পদ্ধতির মাধ্যমে। তারপর বিভিন্ন ভেষজ উপাদান, কাঠের শক্ত টুকরো প্রভৃতি দিয়ে মৃতদেহের অন্তর্ভাগকে ভরাট করা হত। এরপর সমগ্র মৃতদেহের ত্বকে ভেষজ ওষুধ মাখানো হত। তাল থেকে নিষ্কাশিত বিশেষ তেল ও মদ্য (Palm oil and wine) পূর্ণ পাত্রে সমগ্র মৃতদেহকে নিমজ্জিত করা হত। এরপর নির্দিষ্ট সময়ের পরে মৃতদেহকে পাত্র থেকে তুলে সারা শরীরে সূক্ষ্ম লিনেন কাপড় দিয়ে শক্ত করে আবৃত করা হত। তারপর মৃতের মুখে মৃত্যু মুখাবরণ (Death Mask) দিয়ে পরিবৃত করা হত। এই বিশেষ মুখাবরণটি সাধারণত স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত হত। মৃতের শরীরের আন্তর্যন্ত্রগুলি যেগুলি শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে নিষ্কাশিত করা হয়, সেগুলিকে ক্যানোপিক পাত্রের মধ্যে সংরক্ষণ করা হত। এগুলিকে পিরামিডের মধ্যে মমির সঙ্গেই সমাহিত করা হত। পিরামিডের বিভিন্ন কক্ষে মৃতের ব্যবহার্য সবধরনের জিনিসপত্র সমাহিত করা হত। পিরামিডের দেওয়ালে 'মৃতের গ্রন্থ' থেকে বিভিন্ন ছত্র লিপিবদ্ধ করা হত।

পিরামিড হল একধরনের ত্রিভুজাকার পাথর দ্বারা তৈরি সমাধি স্থাপত্য। মূল গর্ভগৃহ ছাড়াও পিরামিডে একাধিক কক্ষ থাকত এবং ভিতরে প্রবেশের জন্য লুকোনো দরজা থাকত। তবে পিরামিডের সম্পূর্ণ স্থাপত্যের পরিকল্পনা এখনও পুরোপুরি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ পিরামিডের স্থাপত্যগত জটিলতা। তবে এই জটিল স্থাপত্যের পিছনে পিরামিডে সমাহিত বিপুল ধনরত্নকে লুণ্ঠনের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার চিন্তাভাবনা দায়ী ছিল। গিজে শহরের কাছে ফারাও খুফুর যে পিরামিডটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেটি ছিল বৃহত্তম। এছাড়া খাফরে এবং মাইসেরিনুস-এর পিরামিড দুটিও যথেষ্ট বড়ো। খুফুর পিরামিডের নীচের অংশ ৫৫৬৯৬ বর্গমিটার বিস্তৃত। প্রায় ১৪৭ মিটার উঁচু ছিল এই পিরামিড। চুনাপাথরের বর্গাকার ইট দিয়ে এই পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছে।